লেখকের কথা

'জীবনের জাগরণে' সিরিজের প্রথম বই ছিলো *বেলা ফুরাবার আগে*। বইটা আমার কতো যে প্রিয় আর বইটাকে ঘিরে গত দুবছরে কতো কতো ঘটনার যে জন্ম হয়েছে, তা বলে শেষ করার মতো না। কীভাবে শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই অপার নিয়ামতের হক আদায় হবে, তা আমার জানা নেই; কিন্তু তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে শেষ করতে পারা আদৌ কি সম্ভব? আলহামদুলিল্লাহ।

বেলা ফুরাবার আগে বইটা যখন লিখি, তখন আমার ধ্যান-জ্ঞান সব যেন বইটাকে ঘিরেই। আমি স্বপ্ন দেখতাম—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছাতে এই বই যুবক-যুবতীদের পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। তারা সালাতের প্রতি উদগ্রীব হচ্ছে, হারাম রিলেশান ছেড়ে দিচ্ছে, ফোন মেমোরি থেকে ডিলেট করে দিচ্ছে সমস্ত গান, যা না শুনলে রাতে তাদের ঘুম হতো না। ফোনের গ্যালারি থেকে তারা মুছে দিচ্ছে সেসকল ছবি আর ভিডিও, যা তাদের কু-প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করতো একদা। তারা বিনয়ী হচ্ছে, সময়ের গুরুত্ব বুঝছে, তারা সুন্নাহ আর নফল পালনের দিকে ঝুঁকছে, ফজর আর তাদের কাযা হচ্ছে না—বইটা লিখবার প্রাক্কালে এসবই ভাবতাম আর আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করতাম। আল্লাহকে বলতাম, তিনি যেন আমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করেন আর বইটাকে কবুল করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর বারাকাহ আর প্রকাশ্য সাহায্য যে কী জিনিস, তা আমি বরাবরের ন্যায় আবারও উপলব্ধি করলাম। *বেলা ফুরাবার আগে* বইটাকে নিয়ে আমি যে যে স্বপ্ন একদা মনে মনে আঁকতাম, হাঁটতে হাঁটতে যে দৃশ্যগুলো দোলা

দিয়ে যেতো আমার হৃদয়ে, সেসবকিছুই আমার রব বাস্তবে পরিণত করেছেন। গোটা বাংলাদেশ তো বটেই, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশের মাঝে বইটাকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস, যে আগ্রহ আমি দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়া, মেইল ও ইনবক্সে বইটা পড়ার পর যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা আমি শুনেছি মানুষের কাছ থেকে, তা দেখে আমি বিশ্বাস করি যে, আমার মহান রব আমার দুআগুলো কবুল করেছেন। তিনি বইটাকে যুবক-যুবতীসহ অনেক অনেক মানুষের পরিবর্তনের অসিলা হিশেবে গ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটা প্রকাশের দুবছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ বইটা পড়ে তাদের পরিবর্তনের কথা জানাচ্ছেন। এ যে কী মধুর ভালো লাগা, তা বর্ণনার জন্য যথাযথ শব্দ দুনিয়ার কোনো ভাষাতে মজুত নেই। আলহামদুলিল্লাহ!

বেলা ফুরাবার আগে বইটাকে আমি বলেছিলাম 'সাজিদ' তৈরির মিশন। *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ* পড়ে যারা সাজিদ হতে চাইবে, তারা যখন জানতে চাইবে সাজিদ হতে হলে তাদের কী কী করতে হবে, আমি বলেছিলাম তারা যেন *বেলা ফুরাবার আগে* বইটাতে চোখ বুলায়। আমি ভীষণভাবে বিশ্বাস করি—আত্মিকভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা না গেলে কখনোই পরম পবিত্রতার সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। আত্মার সেই শুদ্ধতার দিকে যুবক-যুবতীদের ধাবমান করতেই আমি বইটার কাজে হাত দিয়েছিলাম। যেহেতু যুবক বয়সের সমস্যাগুলোর ভেতর দিয়ে আমি নিজেও যেতাম এবং এখনো যাই, তাই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা আমার জন্য কঠিন কিছু ছিলো না। সেই সমস্যাগুলোর পরতে পরতে আমি হাঁটতে চেষ্টা করেছি এবং বের করে আনতে চেয়েছি সেসবের সম্ভাব্য সবচেয়ে সঠিক চিকিৎসাটাই।

অনেক পাঠক আমাকে *বেলা ফুরাবার আগে* বইয়ের দ্বিতীয় কিস্তি আনার অনুরোধ করেছেন। যুবক বয়সের যেহেতু সমস্যার অন্ত নেই এবং তা ক্রমবর্ধমান, তাই আমারও খুব ইচ্ছে ছিলো এই ধরণের আরো বই নিয়ে কাজ করার। আলহামদুলিল্লাহ, মহান রব আমার সেই বাসনাটাও পূরণ করেছেন। *এবার ভিন্ন কিছু হোক* নামে এই সিরিজের পরের বইটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রকাশের সুযোগ দিলেন আমাকে। আমার রবের দরবারে অফুরান কৃতজ্ঞতা।

এবার ভিন্ন কিছু হোক বইটা *বেলা ফুরাবার আগে* বইয়ের পরের কিস্তি। দুটো বই প্রায় একই ধাঁচে লেখা। আমি চেষ্টা করেছি অধ্যায়গুলোকে জীবনঘনিষ্ঠ রাখতে,

যাতে পাঠকেরা পড়ার সময় নিজের অবস্থাকে কল্পনা করতে পারেন। যিনি বইটা হাতে নিয়ে পড়বেন, তার যেন মনে হয় বইটা আমি তার জন্যই লিখেছি এবং বইয়ের কথাগুলো যেন আমি তার পাশে বসে বসে তাকে শোনাচ্ছি। পাঠকের মনোযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি আমি, আলহামদুলিল্লাহ।

এই বইতেও পাঠকেরা অনেকগুলো সমস্যার সমাধান পাবেন এবং আরো পাবেন অনেক আশার আলোও। যেহেতু আমি খুবই আশাবাদী একজন মানুষ, তাই মানুষকে আশা নিয়ে বাঁচতে স্বপ্ন দেখাতেই আমি ভালোবাসি। আর কেনই-বা নিশারাবাদী হবো? অবিশ্বাসীরা ছাড়া আর কারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়?

বেলা ফুরাবার আগে বইয়ের মতো এই বই নিয়েও আমার আকাশছোঁয়া স্বপ্ন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা—তিনি এই বইটাকে যেন কবুল করেন আর আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন। তিনি যেন আমাকে সর্বদা মাটির মানুষ থাকার সুযোগ দেন। সমস্ত অহংকার, রিয়া আর বড়োত্ব থেকে তিনি যেন আমাকে মুক্ত রাখেন।

বরাবরের মতোই আমার পাঠকদের কাছে অনুরোধ—পড়া শেষ হলে বইটা নিজের কাছে রেখে দেবেন না। আপনার নিকটাত্মীয়, বন্ধু, ভাই-বোন বা এমন কারো কাছে বইটা হস্তান্তর করবেন, যার জন্য বইটাকে আপনি দরকারি মনে করবেন। সকল পাঠকের জন্য আমার অফুরান ভালোবাসা। ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা এই বইটার পেছনে যারা বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা সমকালীন প্রকাশনের প্রতি, বইটাকে পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণের জন্যে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের সবাইকে জান্নাতের সবুজ উদ্যানে একত্রিত করেন। আমিন।

ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ
arifazad.bd@outlook.com

সুচিপত্র

আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই	১৭
যে সুতোয় বাঁধা জীবন	৩১
গাহি নতুনের গান	৪২
পতনের আওয়াজ পাওয়া যায়	৫৯
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর	৭২
কখনো ভুল হলে	৮২
বন্দিশিবির থেকে	৯১
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	১০২
যে যাই বলুক পিছে	১১৪
খুলে যাক জীবনের বন্ধ দুয়ার	১২০
খেলাঘর পাতা আছে এই এখানে	১৩৪
হৃদয়ের জানালাটা খুলে দাও না	১৬১
জীবনের কম্পাস	১৬৮
ভালোবাসা ভালোবাসি	১৭৫

সমুদ্রের সাধ ১৮৫
এবার ভিন্ন কিছু হোক ১৮৯

আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই

এক.

যাপিত জীবনের গল্প থেকেই বলি—আমরা যখন রোগে-শোকে ভুগি, যখন শরীরে আমরা অনুভব করি কোনো রোগের উপস্থিতি, তখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার, যিনি আমাদের সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট থাকেন মাথাভরতি ডাক্তারি-বিদ্যা নিয়ে, তার কাছে আমরা খুলে বলি আমাদের অসুবিধের আদ্যোপান্ত। তিনি বোঝার চেষ্টা করেন আমাদের অসুস্থতা। প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন। রোগ নির্ণয়ের পর আমাদের ওষুধ ও জীবনযাত্রার একটা ছক নির্ধারণ করে দিয়ে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করার কঠোর হুঁশিয়ারিও প্রদান করেন।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে কিংবা আশানুরূপ ফলাফল না এলে আমরা ছুটে যাই শিক্ষকদের কাছে। তাদের কাছে—যারা আমাদের চোখে অধিকতর যোগ্য। কৃতকার্যতার অথবা ভালো ফলাফলের পথ বাতলে দিতে যারা সবিশেষ পারদর্শী, তাদের দুয়ারে ধরনা দিই আমরা। ভালো ফলাফলের রাস্তা বাতলে দিয়ে তারা ধন্য করেন আমাদের। কৃতকার্য হতে হলে যে পথ ধরে এগুতে হবে, যে কঠোর-কঠিন সাধনায় লেগে থাকতে হবে মুখ বুজে—সেই পথ তারা আমাদের চিনিয়ে দেন।

মাঝে মাঝে জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, যখন ফিকে হয়ে আসে জীবনের সমস্ত রং, তখন আমরা এমন কাউকে খুঁজি, যে আমাদের একটু আশার আলো দেখাবে।

এমন কাউকে—যার কাছে গেলে আমরা খুঁজে পাবো জীবনের ছন্দ, যার স্পর্শ পেলে হয়তো দপ করে জ্বলে উঠবে নিভুনিভু হওয়া জীবন-প্রদীপ।

যাপিত জীবনের শূন্যতাগুলোকে উত্তম বিকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপনের বেলায় আমাদের থাকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা। যখনই কোনো শূন্যতার বলয়ে আমরা ঘুরপাক খাই, আমাদের অবচেতন মন তার নিজের মতো করে সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। বস্তুত মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যই এটা। মানুষ শূন্যস্থান পছন্দ করে না বলেই তা পূরণে সে সবিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে।

দুই.

রোগ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে ছুটি, পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের উপায় জানতে ধরনা দিই যোগ্য শিক্ষকের কাছে। বিষিয়ে ওঠা জীবনের যাতনা থেকে মুক্তি পেতে আমরা পাগলের মতন খুঁজে নিই পছন্দের ব্যক্তি, বস্তু অথবা মাধ্যম, যা-কিছু আঁকড়ে ধরলে আমরা বেঁচে থাকার প্রেরণা পেতে পারি; তবে যদি প্রশ্ন করি—নফসের তাড়না থেকে বাঁচতে কখনো কি আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে? যে কুপ্রবৃত্তির বলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে সেঁটে আছে জীবন, সেই বলয় ভাঙতে কখনো কি হৃদয়ে দানা বেঁধেছে একটুখানি সাহস?

শরীরে রোগ বাসা বাঁধলে তাকে আমরা সমস্যা বলছি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াকে ডাকছি অপ্রাপ্তি বলে। জীবনের ছন্দপতনের নাম দিয়েছি হতাশা; কিন্তু কুপ্রবৃত্তির যে জালে আমি সারাটাজীবন ধরে আটকা পড়ে আছি, তার জন্য কোনো নাম কিংবা কোনো অভিধা কখনো কি ভেবেছি একবারও?

যে তাড়না আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আল্লাহর নৈকট্য থেকে, যে ধোঁকা আমাকে আত্মমগ্ন করে রেখেছে অবাধ্যতায়, যে আত্মপ্রবঞ্চনায় কেটে যাচ্ছে জীবনের সোনালি সময়, সেই ঘনঘোর অন্ধকার থেকে পালাতে কখনো কি আমার মন চেয়েছে?

কেন আমি বারবার বন্দি হয়ে যাই নফসের শেকলে? কেন কুপ্রবৃত্তির মায়াজাল ভেদ করা আমার জন্য দুরূহ হয়ে ওঠে? কেন বৃত্তের একই কেন্দ্রে আমার নিত্য ভুলের বিচরণ? যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আমার আগমন, সেই উদ্দেশ্য থেকে কেন আমি ভীষণরকম বিচ্যুত? রুহের জগতে মহামহিম আল্লাহ যখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমিই কি তোমার রব নই?', তখন আমি মহোৎসাহে, আনন্দে

আত্মহারা হয়ে, বিস্ময়মাখানো কণ্ঠে বলেছিলাম, 'অবশ্যই, আপনিই আমার রব।'[১] তবে আজ কেন ভুলে গেলাম আমার জীবনের সেই প্রথম আর পরম স্বীকৃতির কথা?

এই যে কুপ্রবৃত্তির বাঁধনে আমি বন্দি হয়ে আছি, সেই শৃঙ্খল ভাঙার উপায় কী? কোন উপায়ে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারবো এই চোরাফাঁদ থেকে? কোন পথে নিহিত আমার মুক্তি? কীভাবে আমি জীবনের সেই আসল উদ্দেশ্যের বাঁকে ফিরতে পারবো—এসব নিয়ে যদি একটু ভাববার ফুরসত পাই, আমার জন্য সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যখনই আমি সমস্যার বৃত্তে ঘুরপাক খাবো, তখন যদি নিবিষ্ট মনে আমি খেয়াল করি আল্লাহর কালাম—এই আয়াতের দিকে, আমি পেয়ে যেতে পারি আমার কাঙ্ক্ষিত সেই সমাধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

> *তাদের পরে এলো এমন এক অসৎ জাতি, যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।*[২]

আমি যদি বুদ্ধিমান হই এবং আমার বিবেচনাবোধ আর উপলব্ধি ক্ষমতা যদি একেবারে ফুরিয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে আমি বুঝে গেছি, আমার শূন্যতাটা আসলে কোথায়। কোন জায়গায় এসে আমার জীবন থমকে গেছে, কোন কেন্দ্রে এসে আমি আসলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কোন ভ্রান্তির মায়াজালে আমি আটকে পড়েছি তা এতক্ষণে আমার চোখে পড়ার কথা ।

হ্যাঁ, আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথাই বলছি। এটাই তো মানবজীবনের ছন্দ। এই ছন্দের শূন্যতাই তো জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। এটি আমার কথা নয়, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা। তিনি ধ্বংস ও অভিশপ্ত এক জাতির উদাহরণ টেনে বলছেন, 'এমন এক জাতি এলো, যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।' আল্লাহ তো বলতে পারতেন, 'তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো এবং সালাত বিনষ্ট করলো।' কিন্তু তিনি সেভাবে বলেননি। তিনি আগে সালাত বিনষ্টের কথা বলেছেন এবং এরপর বলেছেন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কথা।

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭২

[২] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অভিশপ্ত এক জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন যে, তারা সালাত বিনষ্ট করেছে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। তারা কিন্তু আগেই কুপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েনি। আগে তারা সালাত ছেড়েছে। সালাত ছেড়ে দেওয়াতে সহজেই তারা কুপ্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ তারা হয়ে পড়েছে অভিশপ্ত। মোদ্দাকথা—সালাত হলো বান্দা ও শয়তানের মাঝে একটা শক্ত বেষ্টনী। একটা মজবুত দেওয়াল। বান্দা যখন নিজেকে সালাতের সাথে যুক্ত রাখে, তখন শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। যে বান্দা নিজেকে সালাতে হাজির রাখে, শয়তানের তির সেই বান্দাকে আঘাত করতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বান্দাকে তাঁর সুরক্ষা-বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। ভাবছেন, এটিও কি আমার কথা? একদম না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই বলেছেন—

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে দূরে রাখে।[১]

সালাত হচ্ছে বর্মের মতো। যতক্ষণ সালাত নামের বর্মটা সত্যিকার অর্থেই আমার দেহের সাথে লেপ্টে থাকবে, ততক্ষণ শত্রুর আঘাত আমাকে আহত করতে পারবে না। শত্রুর সমস্ত আঘাত এই বর্মে লেগে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অথবা সালাতকে আমরা একটা সুরক্ষা-বলয়ের সাথেও তুলনা করতে পারি। যতক্ষণ আমি এই বলয়ের মাঝে থাকবো, ততক্ষণ আমার দ্বারা কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হবে না। সালাত যখন আমার জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াবে, তখন যাবতীয় মন্দ কথা, মন্দ ভাবনা আমার অন্তরে আর উদিত হতে পারবে না অথবা উদিত হলেও সেসবের ব্যাপারে আমি বেখেয়াল হবো না। যখনই মন্দ চিন্তা আর মন্দ ভাবনা আমার অন্তরে দখল নিতে চাইবে, তখনই আল্লাহর রহমতে আমার ভেতরে সেসবের ব্যাপারে অনুশোচনা তৈরি হবে এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আমি সেগুলোকে আমার ভাবনার জগৎ থেকে মুছে ফেলতে চাইবো।

কিন্তু যখন আমি সালাত ত্যাগ করবো, যখন সালাতের ব্যাপারে আমার হৃদয়-মন উদাসীন হয়ে উঠবে, তখন আমার অন্তরে ঢুকে পড়বে কুপ্রবৃত্তির হাওয়া। যেহেতু আমার সাথে সালাতের তখন সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে, সেহেতু কুপ্রবৃত্তির আশকারাকে প্রতিহত করার এবং অন্তরে উদিত হওয়া সেই মন্দ ভাবনা আর মন্দ চিন্তাগুলোকে

[১] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৫

ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তি আর উৎসাহ আমার ভেতর অবশিষ্ট থাকবে না। আমাকে সালাতবিহীন অবস্থায় পেয়ে কুপ্রবৃত্তির যে হাওয়া আমার অন্তরে জেঁকে বসবে, সেই হাওয়া আমাকে বিফল, বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ বানিয়ে ছাড়বে।

সেই অভিশপ্ত জাতি, যাদের উদাহরণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে টেনেছেন, তাদের কথাই ভাবুন। তারা প্রথমে বিনষ্ট করলো তাদের সালাত। এরপর কী হলো? কুপ্রবৃত্তি তাদের অন্তরে জেঁকে বসলো। কুপ্রবৃত্তির সেই মায়াজাল ভেদ করে তাদের আর বের হয়ে আসা হলো না। এই দ্বৈত পদস্খলনের ফলে তারা পরিণত হয়েছে চরম অভিশপ্ত এক জাতিতে, যাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উদাহরণ হিশেবে পেশ করেছেন। কী এক ভয়ানক ব্যাপার, ভাবা যায়!

এবার চলুন আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করি—কেন আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসা কাটিয়ে উঠতে পারি না? কেন নিজেদের নফসকে দমিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে? কুপ্রবৃত্তির কাছে কেন আমরা বারংবার পরাজিত, ব্যর্থ, শৃঙ্খলিত হচ্ছি? কেন রবের আহ্বানে সাড়া দিতে আমরা অপারগ? কুরআনের সুরলহরি কেন আমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিতে পারে না? উত্তরের জন্য চলুন দৃষ্টি ফেরাই নিজেদের জীবনের দিকে। আত্মসমালোচনার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের জিজ্ঞেস করি—আমি কি আমার সালাত ঠিক রাখতে পেরেছি? আমার সালাত কি সেভাবে আদায় হচ্ছে, যেভাবে আদায় হলে তা সত্যিকারের সালাত হয়ে ওঠে?

যদি আপনি নফসের ধোঁকায় মজে থাকেন, যদি কুপ্রবৃত্তির কালোছায়া গ্রাস করে থাকে আপনার অন্তর, তাহলে ওপরের জিজ্ঞাসার উত্তরে আপনাকে বলতে হবে—না, আমি আমার সালাত ঠিক রাখতে পারিনি। সালাত আদায়ে আমি ভীষণ অলস, অথবা আমার সালাতে কোনো প্রাণ নেই। সালাতে যেভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য অনুভব করতে হয়, তার ছিটেফোঁটাও আমি অনুভব করতে পারি না।

অর্থাৎ, এককথায় আপনি সালাতকে বিনষ্ট করছেন। হয়তো সালাতে হাজিরই হচ্ছেন না, অথবা হাজির হলেও তা একেবারে গা বাঁচানো হাজিরা। সেই হাজিরায় জায়নামাযে আপনার দেহ দাঁড়ায় বটে, মন দাঁড়ায় না। যে সালাতে দেহ আর মনের যৌথ সম্মিলন ঘটে না, সেই সালাত শারীরিক ব্যায়াম বৈ আর কোনোকিছু হয় না।[১]

---

[১] এতে সালাতের হক আদায় হয় না। কেবল সালাতের বিধান পালিত হয়।

তাহলে উপায়? কোন পথে ফেরা যাবে গন্তব্যে? কোন উপায়ে জীবনকে নতুন ছন্দে মাতানো যাবে আবার? কোন সে জিয়নকাঠি, যার স্পর্শে জীবন ফিরে পাবে প্রাণ? মরা গাঙে আসবে বসন্তের জোয়ার? উত্তর আছে ওই একই জায়গায়, ঠিক যে জায়গা থেকে শূন্যস্থানের সৃষ্টি—সালাত। আয়াতটির দিকে আরেকবার খেয়াল করুন—

'তাদের পরে এলো এমন এক অসৎ জাতি, যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।'[১]

তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো, জীবনের ছন্দ হারিয়েছিলো কেবল সালাত বিনষ্ট করে। সালাত বিনষ্ট করায় তারা আপনাআপনি ঢুকে পড়েছে কুপ্রবৃত্তির মায়াবৃত্তে। সেই বৃত্ত থেকে তারা আর বেরোতে পারেনি। তারা হয়েছে পথভ্রষ্ট। আজ আমরা যারা জীবনের ছন্দ হারিয়ে হাপিত্যেশ করছি, জীবনের গতিপথ মন্থর হয়ে যাওয়ায় যারা সমাধানের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমাদের কি একটু সময় হবে সালাতগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করার? যাপিত জীবনের দৈনন্দিন রুটিনে সালাতটাকে 'অবশ্যকর্তব্য' করে নেওয়ার ব্যাপারে একটু মনোযোগী কি আমরা হতে পারি না? বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ না করলে আমাদের অস্তিত্ব যেমন সংকটে পড়ে যাবে, ঠিক সেভাবে সালাতের ব্যাপারে উদাসীনতা মন্থর করে দেবে আমাদের জীবনের সকল ছন্দ, সকল গতিময়তাকে। তাই, কুপ্রবৃত্তির ধোঁকার মাঝে আর হাবুডুবু খাওয়া নয়। আর নয় রোজকার অগোছালো জীবন। আজ, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে চলুন আমরা হয়ে উঠি এক অন্য মানুষ। আমাদের জীবনকে আমরা রাঙিয়ে তুলি সালাত দিয়ে। আর রাঙিয়ে তুলি আমাদের দুনিয়া-আখিরাত—দুটোই।

তিন.

জীবনে কি এমন হচ্ছে যে, কোথাও কোনো সফলতা পাচ্ছেন না? মনে হচ্ছে যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই ব্যর্থতা আপনাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ওত পেতে আছে? পরীক্ষায় আশানুরূপ সফলতা আসছে না, বারবার ব্যবসায় লোকসান গুনছেন, একটা ভালো চাকরির আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষার প্রহর গুনছেন, কিন্তু কোনোভাবেই একটা চাকরির বন্দোবস্ত হচ্ছে না। সংসার থেকে যেন বারাকাহ উঠে গেছে। আয়-রোজগারে খুব মন্দা পরিস্থিতি। হয় এমন?

---

[১] প্রাগুক্ত

আচ্ছা, কখনো কি ভেবে দেখেছেন, কেন এমন হচ্ছে? কেন আপনি বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন? কেন সফলতা হাতছানি দিয়েও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে? কেন আপনার সংসারে আগের সেই বারাকাহ, আগের সেই স্থিতিশীলতা আপনি এখন পাচ্ছেন না? কেন আপনার ব্যবসার পুঁজি, শ্রম, সময়ের বিনিয়োগ আগের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও আপনি সাক্ষাৎ পাচ্ছেন না সফলতার? কখনো খতিয়ে দেখেছেন শূন্যতাটা আসলে কোথায়?

আপনার এই ব্যর্থতার একটা সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ পাওয়া যাবে কুরআনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

> *আর (আমার রব) আমাকে বানিয়েছেন আমার মায়ের প্রতি অনুগত; এবং তিনি আমাকে অবাধ্য, হতভাগ্য করেননি।*[১]

আয়াতের কথাগুলো ঈসা আলাইহিস সালামের, যখন তিনি মায়ের কোলে থাকাবস্থাতেই তার গোত্রের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন। এই আয়াতে তিনি তার গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আমার রব আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন।' মায়ের অনুগত মানে কী? মায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, মায়ের হকের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। মায়ের অবাধ্য না হওয়া, মায়ের দেখভাল করা, মায়ের প্রতি রূঢ়, বিরূপ আচরণ না করা, মায়ের মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা পূরণ করা ইত্যাদি মায়ের অনুগত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। ঠিক এরপরেই ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'তিনি আমাকে বানাননি অবাধ্য, হতভাগ্য।'

আয়াতটির দুটো অংশ। প্রথম অংশে মায়ের অনুগত হওয়ার কথা, দ্বিতীয় অংশে অবাধ্য না হওয়া এবং হতভাগা না হওয়ার কথা।

এই আয়াতে 'হতভাগ্য' বলতে আরবি 'শাক্বিইয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ—বিফল হওয়া, ব্যর্থ হওয়া, অসফল হওয়া। Lack Of Success এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে একই সুরার ৪ নম্বর আয়াতে, যেখানে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম দুআর মধ্যে বলছেন, 'হে আমার রব, আমি তো কখনো আপনাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি।'

---

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩২

আয়াতটি থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে—ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের অনুগত হওয়ার দাবি উত্থাপনের ঠিক পরেই বললেন, তাকে ব্যর্থ বা অসফল বানানো হয়নি। তাহলে, মায়ের আনুগত্যের সাথে সফল হওয়া না-হওয়ার একটা সম্পর্ক প্রতীয়মান হচ্ছে না এখানে? এটাই হচ্ছে এই আয়াতে কুরআনের বার্তা।

এবার তাহলে নিজেদের জীবনের দিকে একটু তাকানো যাক। এই যে জীবনজুড়ে অসফলতার ছড়াছড়ি, ব্যর্থতার সকরুণ গল্প, এই ব্যর্থতা ঠিক কী কারণে আপনার ওপর নিপতিত হয়েছে, তা কি খুঁজে বের করা উচিত নয়? যদি জিজ্ঞেস করি—মায়ের সাথে আপনি কি যথাযথ আচরণ করেন? মায়ের হকগুলোর ব্যাপারে, মায়ের অধিকারগুলোর ব্যাপারে আপনি কি সর্বদা তৎপর ছিলেন বা আছেন? আপনি কি মায়ের সাথে গলা চড়িয়ে কথা বলায় সিদ্ধহস্ত? তার মতামতকে, তার আবদারকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে আপনি কি সহজেই উড়িয়ে দেন? আপনি কি মায়ের চাহিদাগুলোর যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন?

এই জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে আজই আপনার মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। যে ভুল আপনি গর্ভধারিণী মায়ের সাথে করে এসেছেন, যে অশোভন আচরণে আপনি বারংবার ক্ষত-বিক্ষত করেছেন তার অন্তর, সমস্ত কিছুর জন্য তার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চান। পা জড়িয়ে ধরে কাঁদুন। ছোটোবেলায় যেভাবে তার আঁচল-তলে লুকোতেন, তার গলা জড়িয়ে কাঁদতেন, ঠিক সেভাবে। বিশ্বাস করুন—আপনার ব্যর্থতার কারণ ঠিক এখানেই লুকিয়ে আছে। এখানে এসেই আপনি বারবার হেরে যাচ্ছেন। আপনার জীবনে বারাকাহর যে ঘাটতি, তার শুরুটা ঠিক এখান থেকেই।

মায়ের সামান্য অবাধ্যতা জীবনে কীরকম বিপদ ডেকে আনতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে পাই। হাদিসে বনু ইসরাইল যুগের একজন নেককার বান্দার কথা বলতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বনু ইসরাইল সম্প্রদায়ে জুরাইজ নামে অত্যন্ত নেককার একজন লোক ছিলেন। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য তার ছিলো আলাদা একটা জায়গা এবং সেখানে তিনি সারাদিন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। একদিন এমনই এক সময়ে জুরাইজ যখন তার ইবাদতে মগ্ন, তার মা এসে তাকে ঘরের বাইরে থেকে ডাক দিলেন। মায়ের ডাক শুনে তিনি কি ইবাদত ত্যাগ করে মায়ের কাছে ছুটে যাবেন, না ইবাদত সম্পূর্ণ করে তারপর মায়ের ডাকে সাড়া